Subhashis Chatterjee
Assistant Professor, Department of Bengali, Kalinagar Mahavidyalaya

MIL (CODE: BNGLCOR02T) UNIT 4B রবীন্দ্রনাথের গল্প

পরীর পরিচয়

বিষয়বস্তুঃ রাজকুমার বিবাহযোগ্য হলে স্বাভাবিক ভাবেই বিভিন্ন স্থান থেকে তাঁর জন্য বিবাহের সম্বন্ধ আসতে থাকে। যদিও কোনও পাত্রীই তার মনঃপুত হয় না। কেননা নবীন পাগলা বলে এক ভাবপাগলের কাছে যখন থেকে সে পরীদেশের কথা শুনেছে, তখন থেকেই সে পরীকে বিবাহ করবে বলে মনস্থির করে বসে আছে।

পুত্রের চাহিদার কথা স্মরণে রেখেই রাজা পরিলোকের সন্ধান পাওয়ার জন্য পণ্ডিতদের নিয়োগ করলেন। কিন্তু তাঁরা বইয়ের পাতা সন্ধান করে নিজেদের অসহায়তার কথা রাজাকে জানালেন।বণিকদের রাজসভায় ডেকে জানতে চাওয়া হল তাঁরা এরকম কোন রাজ্যের সন্ধান জানেন কিনা? কিন্তু তাঁরাও নিজেদের অক্ষমতার কথা শোনালেন। অবশেষে মন্ত্রীপুত্রের কাছে সংবাদ পেয়ে রাজা নবীন পাগলাকে ডাকলেন। তিনিই রাজাকে পরীরাজ্যের সংবাদ জানালেন। কিন্তু রাজা তাঁর কথায় বিশ্বাস করতে পারলেন না। তাঁর ভাবের কথা রাজার কাছে পাগলামি বলে মনে হল।

KNMV

রাজা নবীন পাগলের কথায় অবিশ্বাস করলেও রাজপুত্রের শ্রুত হল নবীন পাগলের কথা। কাউকে না জানিয়ে সে পরীর খোঁজে গেল পরীর দেশে। চিত্রগিরি পর্বত আর কাম্যক সরোবরের পরিবেশে সেই দেশ। কিছু প্রতীক্ষার পরে তাঁর মনে বিশ্বাস জাগল পরীকে পাওয়ার প্রত্যাশা তার মিথ্যে হবে না। মনের বিশ্বাস তার কাছে সত্য বলে মনে হল, যখন সে সত্যি দেখতে পেল সেই স্থানে দেখতে পেল পাহাড়ী মেয়ে কাজরীকে।

কাজরীকে সঙ্গে নিয়ে রাজকুমার ফিরে এলো রাজপুরীতে। কাজরীকে দেখে সবার মোহভঙ্গ হল, কেউ তাঁকে পরী বলে মেনে নিতে পারল না। রাজকুমারের কিন্তু কাজরীকে পরী বলে ভাবতে কোনো সংশয় ছিল না। কিন্তু কাজরীর পরীর রূপ দর্শনের প্রতীক্ষায় ক্রমশ সে অধীর হয়ে উঠতে লাগল। ঘরের লোকদের বারংবার উপহাস তার ধৈর্যের বাঁধ একটু একটু করে ভাঙতে লাগল। একদিন হৃদয়ের টানেই রাজকুমার কাজরীর কাছে তার স্বরূপ প্রকাশের আবেদন জানিয়ে বসলো। কাজরী রাজ পরিবার থেকে চলে গিয়ে নিজের পরীর পরিচয়কে তুলে ধরল।

রূপক গল্প হিসেবে সার্থকতা

রাজকুমারের মনের পরিচয় দানের মধ্যেই পরীর পরিচয় গল্পের সূত্রপাত। রাজকুমারের কাব্যপাঠপ্রিয়তার মধ্যেই তার ভাবুকতার পরিচয় নিহিত। তার ভাবপ্রবণ মানসিকতায় নবীন পাগলার কথা যত মনে ধরে, তার একান্ত প্রিয়জনদের কথাও সেই পরিসরে প্রাধান্য পায় না। তাই নবীন পাগলের কথায় সে পরীর সন্ধানে সংকেত স্থানে গিয়ে উপস্থিত হয়েছে। ভাবকল্পনার জগতে অবিশ্বাসী, বাস্তববাদী বলেই গ্রন্থকীট পণ্ডিত ও অর্থলোভী বণিক পরীলোকের সন্ধান পায় না। পরীলোকের সন্ধান রয়েছে ভাবপ্রবণ নবীন পাগলার কাছে। পাণ্ডিত্যের গর্ব কিম্বা অর্থের অহমিকা থেকে সে উন্নীত, বাঁশি বাজিয়ে সে বনে প্রান্তরে ঘুরে বেড়ায়। আর কোন কাজ তার আছে বলে মনে হয় না। এই কারণেই সে জগতের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের কাছে উপহাসের পাত্র। যা অন্যের কাছে অবিশ্বাস্য, নবীনের কাছে তা সহজ স্বাভাবিক। প্রকৃতিলোকের একটু আধটু ইঙ্গিতেই সে পরীলোকের সন্ধান পায়। কারণ জগতের আনন্দযজ্ঞে ঘুরে বেড়ানোর তাঁর অবাধ অধিকার। চাওয়া পাওয়ার সরল সমীকরণের সে উর্দ্ধে। রাজকুমার তাকেই বিশ্বাস করেছে যে সেই রাজকুমারের স্বপ্নকে সত্য করে তুলতে পারবে। রাজকুমার ও নবীনের ভাব দেখে পণ্ডিত, বণিকসহ অপর সামাজিক হিসেবী লোকেরা পরিহাস করে, তাদের বলে উদভ্রান্ত।

KNMV

সুতরাং দেখা গেল গল্পটিতে দুটি পক্ষ। এক পক্ষ রাজকুমার, নবীন পাগলা আর অপরপক্ষে রাজা, পণ্ডিত, সওদাগর প্রমুখ আর এই দুই পক্ষের মাঝখানে পরী। এক পক্ষের কাছে যা একেবারে সহজ সত্য অন্যপক্ষের কাছে তা একেবারে অলীক, অবাস্তব। এক পক্ষের কাছে যা জীবনের পর্যাপ্তি, অন্য পক্ষের কাছে তা জীবনের বিচ্যুতি।

সমগ্র রচনাটির মূলে আছে একটি গূঢ়ার্থ। তত্ত্বটি ভাবের কথা। ভাবরসের সে তত্ত্বটি ঘোর বস্তুবাদী, বুদ্ধিবাদী ব্যক্তিরা তা বোঝেন না, বুঝতে চান না। মর্মবাদীরাই তা বোঝেন। রসিক মরমিয়ারা ভাবকে অনুভূতির দৃষ্টি দিয়ে দেখেন, তাই তাঁরা সামান্যের মধ্যে অসামান্য, প্রত্যক্ষের মধ্যে পরোক্ষকে দেখতে পান। কিন্তু তাঁদের কথা বস্তুবাদী প্রত্যক্ষবাদীরা বোঝেন না। ভাববাদীদের আচরণ দেখে, তাঁদের কথা শুনে তাঁরা হাসেন, উপহাস করেন। আবার ভাববাদীরা প্রত্যক্ষবাদীরা বস্তুবাদীদের

ভাবহীন মনের দৈনের জন্য দুঃখিত হন, তাঁদের জন্য এঁদের সমবেদনা জাগে। মনে হয় 'দুজনে কেহ কারে বুঝিতে নাহি পারে, বোঝাতে নারে আপনায়।' মর্মহীন, ভাবহীন বুদ্ধিসর্বস্ব এই বস্তুবাদীদের কথাই বুঝি বৈষ্ণব কবি বলেছিলেন,

মরম না জানে ধরম বাখানে
এমন আছয়ে যারা
কাজ নাই সখি তাঁদের কথায়
বাহিরে রহুক তারা।

যে অনুভব তিলে তিলে নতুন হয়ে ওঠে তার কথা নীরস বস্তুবাদীরা বুঝবে কি উপায়ে! রবীন্দ্রনাথ আলোচ্য গল্পে মনে হয় ভাববাদ বস্তুবাদের সেই চিরন্তন দ্বন্দ্বকে রূপকের মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলেছেন। এই রূপকে নবীন পাগলা ও রাজকুমার ভাববাদীদের প্রতিনিধি, রাজা, পণ্ডিত ও তার সহচরেরা বস্তুবাদীদের প্রতিনিধি, পরী হচ্ছে তার মাধুরী, আর পরীলোক হল ভাবলোক, সৌন্দর্যলোক।

KNMV

চরিত্রের আলোচনা না করলে রূপকের আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। তাই এবার আসা যাক চরিত্রের আলোচনায়।

নবীন পাগলা

গল্পের অন্যতম প্রধান চরিত্র নবীন পাগল। সেই পরীলোকের সঙ্গে বস্তুজগতের বন্ধনের সেতু। ভাববাদী, অনুভূতিশীল নবীন চিরনতুনের পূজারী। নবীন নামটি এখানে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। বাইরের স্বরূপ দেখে তাকে চেনা কঠিন। তাকে চিনতে হলে তার আন্তঃস্বরূপকে চিনতে হবে। আমাদের দৃষ্টির ক্ষীণতার জন্য আমরা নবীনের মত মানুষকে চিনতে পারি না। ভাব যদি মনে থাকে তাহলে তাকে চিনে নিতে অসুবিধা হয় না। কিন্তু যতক্ষণ তাকে চেনা যায় না ততক্ষণ সকলের চোখে থাকে ভোগের আস্তরণ, সেই ভোগবাদীদের উদ্দেশ্যেই রাজা নবীনের স্বরূপ পরিচয় নিজের ব্যর্থতাকে ঢাকতে রসিকতার সুরে বলেন 'এর আগাগোড়া সমস্তই পাগলামি'।

পরীর পরিচয়

কোনও বিষয়ের প্রতি আমাদের ভালোলাগা মনের মধ্যে এক অনির্দেশ্য কামনা সৃষ্টি করে। বাস্তবে সম্ভব না হলে কল্পনায় আমরা তার পরিতৃপ্তির উপায় খুজি। এই ভাব মনের অনুভূতির উপর নির্ভরশীল। অনুভূতি দীর্ঘস্থায়ী হয় না। তাই ভাবের অবস্থানও দীর্ঘস্থায়ী হয় না। বাস্তবে এসে ভাবকে দীর্ঘস্থায়ী হওয়ার আবেদন জানালে তা কখনো সফল হয় না। ভাব যতটুকু তার অবস্থানও ততটুকু। পরীলোকে গিয়ে কাজরীকে পরী ভেবে রাজকুমার নিয়ে এসেছিলেন। কাজরীকে পরী ভাবতে অন্যেরা অনিচ্ছুক হলেও রাজকুমার যতক্ষণ নিজে সংশয়হীন থেকেছেন, ততক্ষণ কাজরীর পরীরূপ অক্ষুণ্ন থেকেছে। কিন্তু রাজকুমারের মনে অনুভূতির তীব্রতা যত ক্ষীণ হয়েছে, কাজরীকে নিয়ে তার মনের মধ্যে সংশয় ততই তীব্র হয়েছে। সুতরাং ভাবের জগতকে অতিক্রম করে যতই বাস্তবের মুখোমুখি হয়েছেন রাজকুমার তখনই কাজরীর রাজপ্রাসাদ থেকে চলে যাওয়া অনিবার্য হয়েছে। কাজরীও ফাঁকি দিতে চায়নি। তাই সে চলে গিয়েছে। রাজকুমারের মনে হয়েছে ‘চলে গিয়েছে সে আপন পরিচয়’ দিয়ে গেল? কী সেই পরিচয়? প্রথমত, ভাবকে বাস্তবিক রূপে চাইলে তাকে পাওয়া যায় না। দ্বিতীয়ত, কাজরীকে পরী ভেবে রাজকুমার নিয়ে এসেছিল। কাজরীকে পরী ভাবা রাজকুমারের ভুল। তাই রাজকুমার যখন কাজরীর পরী স্বভাব দেখতে চেয়েছে তখন কাজরী বুজেছে রাজকুমারের তাকে ঘিরে থাকা মোহ কেটে গিয়েছে। তাই সে প্রতারণা করতে চাইনি। কাজরী বুঝেছে রাজকুমার তাকে ভালবাসিনি, ভালোবেসেছে তার মধ্যে রাজকুমারের ভাবনায় লুকিয়ে থাকা পরীর ধর্মকে, তার সৌন্দর্যকে। তাই প্রিয়তমকে অপ্রাপনীয় ভেবে সে সেখান থেকে চলে গিয়েছে। ফলে রাজকুমার কাজরীকে পেয়েও হারিয়েছে।

KNMV

রাজকুমার

এই গল্পের মুখ্য বা কেন্দ্রীয় চরিত্র রাজকুমার। সে ভাববাদী, কাল্পনিক। কল্পনা আর স্বপ্ন তার মনবীণার তারে তারে বাজে। স্বপ্ন তার কাছে আসে বাস্তবের রূপ হয়ে। ফলে সে যাকে পায় তাকে অনেকখানি করে পেতে চায়। কিন্তু তার এই চাহিদা বাইরের লোক তো বটেই তার প্রিয়জনের কাছেও হাঁসির খোরাক হয়। কিন্তু এই

ভাববাদী চরিত্রকে গল্পকার রক্তমাংসের সজীব চরিত্র করে তুলেছেন তার চরিত্রে অন্তরদ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে। নবীনের কথা আড়াল থেকে শুনে রাজকুমার পরীলোকে গিয়ে যখন কাজরীর হাঁসি শুনে তার মনে হয়েছিল ‘এই হাঁসির সুর যেন সেই বাঁশির সঙ্গে মেলে, এর হাঁসির সুর এই ঝরনার সুরের সঙ্গে মেলে এ আমার এই ঝরনার পরী।’ এই রাজকুমার গল্পের শেষাংশে পরিজনের কথাতে বিশ্বাস করে কাজরীর পরীধর্মকে সন্দেহ করেছে। গল্পকারের ভাষায়’ দিনের পর দিন যায় রাজপুত্র জ্যোৎস্নারাত্রে বিছানায় জেগে উঠে চেয়ে দেখে, কাজরীর ছদ্মবেশ একটু কোথাও খসে পড়েছে কিনা?’ কাজরীর মধ্যে তার কামনার পরীকে খুঁজে দেখার অপ্রাপ্তিতে রাজকুমার কাজরীকে বলে ‘তুমি কি আমায় চিরদিন ফাঁকি দেবে?’ পরীকে, তার মাধুরীকে এমনি করেই পাওয়া যায়, তার বেশি পেতে চাইলে সে মিলিয়ে যায় শূণ্যে। তার ভাবরূপ নষ্ট হয়ে যায়। তাই সে রাজকুমারকে ছেড়ে চলে যায়। রাজকুমারের ভাষায় ‘আপন পরিচয় দিয়ে’। সুতরাং রাজকুমারের আচরণের তিনটি সুস্পষ্ট স্তর আছে। প্রথমটি তার ভাববাদের স্তর, যেখানে নবীনের কথায় ভরসা করে পরীলোকে গিয়ে সে কাজরীকে পরী বলে নিয়ে এসেছে। দ্বিতীয়ত, বাস্তববাদে উত্তীর্ণ হয়ে সে তার মনের বিশ্বাসের সত্যতা যাচাই করেছে। তৃতীয়ত, পরী চলে গেলে তার আচরণে দুটি পৃথক ভাবের সহাবস্থান লক্ষ্য করা গিয়েছে। একদিকে মনে হয় সে পুনরায় তার ভাবলোকে ফিরে গিয়েছে, অন্যদিকে কাজরী যে সত্যিকারের পরী সেই সত্য উপলব্ধি করে তার আচরণের যথার্থতা নিজেই খুঁজে পেয়ে তৃপ্তিলাভ করে। এভাবেই রাজকুমার যেন গুপ্তধনের ধনঞ্জয় কিম্বা রক্তকরবীর রাজার সার্থক উত্তরসুরী হয়ে উঠেছে।

সবশেষে আসা যাক গল্পের গঠনের আলোচনায়।

সমগ্র গল্পটি সাতটি অংশিকায় বিভক্ত, যেগুলি দেখতে আলাদা বলে মনে হলেও গভীর সংযোগসূত্রে আবদ্ধ। অংশিকা গুলিকে তুলে ধরা যেতে পারে সূত্রাকারে

প্রথম রাজকুমারের বিবাহযোগ্য হওয়ার সংবাদ। তার পরীকে বিবাহ করার সংকল্প।

দ্বিতীয় রাজার পরীলোককে সন্ধানের উদ্যোগ। পণ্ডিত আর বণিক মহলের সে বিষয়ে অজ্ঞতা প্রকাশ। বাঁশীবাদক নবীনের কাছে পরী লোকের সন্ধান লাভ। রাজার নবীনের কথায় অবিশ্বাস।

তৃতীয় রাজকুমারের বাঁশিওয়ালার কথায় আশ্বস্ত হওয়া। সেই অনুসারে তার পরীলোকে যাত্রা। সেখানে কিছুকাল থাকার পর পরীর অবস্থান বিষয়ে স্থির বিশ্বাসে উপনীত হওয়া।

চতুর্থ পরীলোকে রাজকুমারের পরীকে খুঁজে পাওয়া।

পঞ্চমত, রাজপুরীতে রাজকুমার ও পরীর আগমন। পরীকে দেখে রাজমাতা ও রাজদুহিতার আশাভঙ্গ হওয়া।

ষষ্ঠ পরীর ছদ্মবেশ ছেড়ে নিজ স্বরূপে আবির্ভূত হওয়ার প্রত্যাশা রাজকুমারের মনে। কবে সেই দিন আসবে তা ভেবে রাজকুমারের উৎকণ্ঠিত হওয়া।

সপ্তম পরীর রাজপরিবার থেকে চলে যাওয়া।

গল্পটির এই বিন্যাস গল্পটিকে সার্থকভাবে ছোটগল্পের ধর্ম বজায় রেখে পরিণতি অভিমুখে পৌঁছে দিয়েছে।

KNMV

ছোটগল্পের স্বভাব ধর্মকে পূর্ণতা দিয়েছে গল্পটির সংক্ষিপ্ততম অবয়ব, যা পূর্ণ করতে সহায়তা করেছে চিত্রকল্প, ছন্দ ও অলংকারের সুসংবদ্ধ ব্যবহার।

প্রথমে দেখে নেওয়া যায় গদ্য ছন্দের নিপুণ ব্যবহার।

‘সেই যে আছে/নবীন পাগলা/ বাঁশি হাতে

বনে বনে/ ঘুরে বেড়ায়/ শিকার করতে গিয়ে

রাজপুত্র/ তারই কাছে/ পরীস্থানের/ গল্প শোনে।’

এবার আসা যাক অলংকার ব্যবহার বৈশিষ্ট্যে-

বাচ্যোতপ্রেক্ষাঃ

‘গান্ধার রাজের মেয়ের অঙ্গে অঙ্গে লাবণ্য ফেটে পড়ছে, যেন দ্রাক্ষালতায় আঙুরের গুচ্ছ’।

উপমাঃ

‘কম্বোজের রাজকন্যাকে দেখে এলেম; ভোরবেলাকার দিগন্ত রেখাটির মতো বাঁকা চোখের পল্লব, শিশিরে স্নিগ্ধ, আলোকে উজ্জ্বল’

পরীলোকের সৌন্দর্য বোঝাতে গল্পকার যে চিত্র ব্যবহার করেন, সেখানে প্রকৃতির রূপ মর্মরিত হয়ে ওঠে- ‘ফাগুণ মাসে তখন ডালে ডালে শালফুলে ঠেলাঠেলি, আর শিরীষফুলে বনের প্রান্ত শিউরে উঠেছে, রাজপুত্র চিত্রগিরিতে একা চলে গেল।’

সব মিলিয়ে বলা যায় পরীর পরিচয় একটি আশ্চর্য শিল্প সুন্দর ছোটগল্প।

গ্রন্থঋণঃ

১) কথকোবিদ রবীন্দ্রনাথ- নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

২) রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস ও ছোটগল্প- উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

৩) রবীন্দ্রনাথের গদ্যকবিতা- ধীরানন্দ ঠাকুর

৪) রবীন্দ্র ছোটগল্পের শিল্পরূপ- তপোব্রত ঘোষ

KNMV

তোতাকাহিনি

প্রকাশসাল ১৩২৪ বঙ্গাব্দের (১৯১৭ খ্রিষ্টাব্দ) সবুজপত্র পত্রিকার মাঘ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। পরে সংকলিত হয় লিপিকা গ্রন্থে।

মূল কাহিনি

এক মূর্খ পাখিকে শিক্ষাদানের প্রসঙ্গে সমগ্র গল্পটি রচিত হয়েছে। পাখিটির স্বাধীনতায় উৎকণ্ঠিত রাজা মহাশয় পাখিকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য মন্ত্রীকে নির্দেশ দিলেন। এখান থেকেই গল্পের সুত্রপাত। পাখিটিকে শিক্ষা দেওয়ার ভার পড়ল রাজার ভাগিনাদের উপর। পণ্ডিতেরা বিচার করে রাজাকে জানালেন পাখিটিকে শিক্ষা দিতে হলে সবচেয়ে আগে প্রয়োজন একটা খাঁচা, যেখানে পাখিটিকে বেঁধে

Subhashis Chatterjee
Assistant Professor, Department of Bengali, Kalinagar Mahavidyalaya

রাখা যাবে। স্যাকরা রাজার আদেশে একটি চমৎকার খাঁচা বানিয়ে দিল। পণ্ডিত পাখিটিকে শিক্ষা দিতে বসে সবার আগে পাঠ্য পুস্তকের সংখ্যা বৃদ্ধির প্রয়োজনে প্রচুর পুঁথি লিপিকরদের দিয়ে নকল করালেন। পাখিটিকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য আয়োজন ও উদ্যমের অভাব হল না। এদিকে নিন্দুকেরা পাখিটির প্রকৃত অবস্থা পর্যালোচনা করে জানালো আয়োজনের খামতি না থাকলেও পাখিটির খবর কেউ রাখে না। রাজা ভাগিনাদের কাছে কৈফিয়ত তলব করলে তারা জোড় দিয়ে আত্মপক্ষ সমর্থন করল। রাজা ভাগিনাদের সোনার হার উপহার দিলেন।

KNMV